কথাসাহিত্য

৪১ বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা চৈত্র, ১৩৯৭
Vol. 41 No. 6 March, 1991

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

পথে ও পথের প্রান্তে ১
পাঠকের চিঠি / ৫

গল্প

নেলী নাগের অপমৃত্যু / মায়া বসু ৯
ঘরের মেয়ে / অনুপ ঘোষাল ১৯
শ্যামলীর রাত / মানবেন্দ্র পাল ৩০
নিখোঁজ সংবাদ / এ. মান্নাফ ৩৪
আগুনেমাটির যাত্রাপালা / ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় ৪৬
স্যাম এল আমেরিকা থেকে / আইজ্যাক ব্যাসেভিস সিঙ্গার, অনুবাদ— সোমনাথ রায় ৫৫
ভোরের আমলকি / অমলেন্দু মিত্র ৬৪

সমালোচনা

পত্র-পত্রিকা / অন্নতোষ ঘোষ ৬০
গ্রন্থ-জিজ্ঞাসা / গোপাল ভৌমিক, ৭
উদয় চক্রবর্তী ও ৭২
মানস মজুমদার ৭৩

বারোয়ারী উপন্যাস

নবরত্ন / ? ৩৯

ধারাবাহিক উপন্যাস

মুশকিল আসান / সমরেশ মজুমদার ৭৫

প্রবন্ধ

উৎসর্গপত্র : কালীপ্রসন্ন সিংহ / নরেশচন্দ্র জানা ১৬

ভ্রমণ

এক দুর্গম ভ্রমণ / তনুকা ভৌমিক ২৪

বিবিধ

কাকভূষণ্ডীর আলাপচারি ৭
ডাক্তারের অভিজ্ঞতা / ডাঃ বনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৩

কবিতা

প্রতীক্ষায় আছি / নিখিলরঞ্জন মাইতি ৩
অধরাকে / দীপা গঙ্গোপাধ্যায় ৩
যখন ভাঙন / সুজাতা গঙ্গোপাধ্যায় ৩
তোমায় ভালোবাসলাম আন্দামান / কমলা রায় ৪
ভাসমান মেঘের মতো / মালবিকা রায় ৪

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

কথাসাহিত্যের আগামী সংখ্যা **নববর্ষ সংখ্যা** রূপে প্রকাশিত হবে।
এই সংখ্যার মূল্য হবে ৬·০০, গ্রাহকদের অতিরিক্ত মূল্য লাগবে না। সডাক বার্ষিক চাঁদা—৫৬·০০

কার্যালয় : কথাসাহিত্য, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০৭৩ ফোন : ৩২৫০৫৪, ৩১৬৪২০
Office : Katha Sahitya, 10 Shyama Charan De Street, Calcutta-73, Phone : 325054, 316420

এক দুর্গম ভ্রমণ

তনুকা ভৌমিক

মোটঘাট কাঁধে করে সিমলার লক্কড়বাজার বাস-স্ট্যাণ্ডে যখন তিন-মূর্তি পৌছলাম, তখনও ভোরের আলো ফোটে নি। কল্পার বাস ছাড়ার কথা সাড়ে পাঁচটায়। এরই মধ্যে বাস-স্ট্যাণ্ডে গাদাগাদি ভিড়, কারণ বাইরে টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। ভিড় ঠেলে ছাউনির তলায় জিনিসপত্র রেখে দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডায় কাঁপছি। বৃষ্টির বহর দেখে মনে সন্দেহ জাগছে, কলকাতায় এক পরিচিতের পরামর্শে হিমাচল প্রদেশের 'কিন্নর'-এর জেলা সদর কল্পায় যাওয়া ঠিক করে ফেলে, ঝোঁকের মাথায় সিমলার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের অফিস থেকে 'ইনার-লাইন-পারমিট' যোগাড় করে ভুল করলাম না তো?

অপেক্ষা করতে করতে বাস এল ছটায়। হিমাচল রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের স্থানীয় সাধারণ বাস। যাবে সিমলা থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে নারকাণ্ডা-রামপুর-পিও (Peo) হয়ে কল্পা। কল্পা পৌছতে কটা বাজবে জানতে চাইলে কেউ বলল সন্ধে ছটা, কেউ বলল আটটা। মনটা দমে গেল—রাত-বিরেতে অচেনা জায়গায় পৌছে থাকব কোথায়? ভেবে লাভ নেই; ভাগ্যকে ছেড়ে দিলাম বাস-ড্রাইভার আর প্রকৃতির হাতে। কাঁচের জানলা দিয়ে বাইরে তাকালে অঝোর বৃষ্টিধারায় স্নান করা সবুজের জলরঙ। নিসর্গ-দৃশ্য স্পষ্টভাবে কিছুই বোঝা যায় না। বাসের ভিতরে লোক নানা ভঙ্গীতে বসে ও দাঁড়িয়ে আছে; আমাদের সামনের সিটে অবিশ্বাস্যভাবে তিনজনের জায়গায় পাঁচজন বসেছে এবং একে অন্যের কাঁধে, পিঠে মাথা রেখে যেন দলবদ্ধভাবে ঘুমোচ্ছে। নাকে আসছে বিড়ির কটু গন্ধ, মাঝে মাঝে শুনতে পাচ্ছি হিন্দী-মেশানো স্থানীয় ভাষায় কথোপকথন।

বিরক্ত হয়ে নিজেই বোধহয় কখন ঝিমোতে আরম্ভ করেছিলাম, হঠাৎ চটকা ভেঙে দেখি বাস দাঁড়িয়ে রয়েছে। সামনে পাহাড়ী সরু রাস্তার উপর এক মস্ত পাথর। বর্ষায় পাহাড়ের আনাচেকানাচে ধস নামে, তার নিদর্শনস্বরূপ আমাদের পথ আগলে ঐ পাথরের চাঁই। জনদশেক স্থানীয় লোক নেমে গেল পাথর সরাতে—গরজ তো যাত্রীদেরই। আবার ছুটল বাস। এতক্ষণে আকাশ একটু পরিষ্কার হয়েছে, বৃষ্টি যদিও সঙ্গ ছাড়েনি। জানলার বাইরে দেখতে পাচ্ছি অনেক আপেলের বাগান; টুকটুকে লাল ফলের ভারে গাছগুলো নুয়ে পড়েছে। ছাইরঙের পাথরের টালি দিয়ে ছাওয়া ছবির মত বাড়ি, চামরের মত ল্যাজ-দোলানো কুকুর, আপেলেরই মত লালচে গালের ছোট্ট মেয়ে, সব জানলার পাশে দেখা দিয়েই চলে যাচ্ছে। আর সমস্ত দিক জুড়ে রয়েছে বৃষ্টিতে ভেজা সবুজ পাহাড়—একটার পিছনে আর একটা, তার পিছনে আরও, তাদের শেষ নেই।

সিমলা থেকে ১৩০ কিলোমিটার দূরে রামপুরে যখন পৌছলাম, ততক্ষণে অনেকটা নিচে নেমে এসেছি। পথে না জানি কখন শতদ্রু আমাদের সঙ্গ নিয়েছে—এখানে বলে সাটলুজ। রামপুর থেকে কয়েক কিমি দূরে জিয়োরী বলে এক জায়গায় বাস দাঁড়াল যাত্রীদের মিধ্যাহ্নিক ভোজনের সুযোগ দেবার জন্য। জিয়োরী জায়গাটা খুবই ছোট; শৌচাগার নেই, খাবার দোকান হাতে গোনা যায়। স্থানীয় বাসে স্থানীয় লোকেদের সঙ্গে যাতায়াত করার অসুবিধা তখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি (গোটা বাসে আমরা ছাড়া আর কোন ট্যুরিস্ট নেই)। জিয়োরী থেকে বাস রওনা হল বেলা দুটোর পর। এর পর থেকেই লক্ষ্য করলাম প্রকৃতির চেহারা পালটাতে শুরু করেছে।

সিমলা, কুলু, মানালি, সব জায়গায় দেখেছি পাহাড়ে সবুজের ছড়াছড়ি। পাইন গাছসহ নানা সরলবর্গীয় গাছ, আপেল গাছ, এমন কি কোন কোন জায়গায় খেজুর গাছ পর্যন্ত দেখেছি। জিয়োরী ছাড়াবার পর আস্তে আস্তে এই সোঁদা সবুজ কোথায় হারিয়ে গেল। পাহাড় যেন তার সবুজ মখমলের পরত খসিয়ে পাথরের নগ্নতায় ধরা দিয়েছে আমাদের কাছে। তার গায়ে ইতস্তত রয়েছে ছোট ঝোপ

ও ক্ষুদ্রাকার গাছ। পাশে বয়ে চলেছে শতদ্রু পাথরে আঘাত করতে করতে। কিছুক্ষণ চলার পর বাস এসে দাঁড়াল ওয়াংটু চেকপোস্টে। এখান থেকেই শুরু হচ্ছে 'কিন্নরভূমি'—আমরা চলেছি হিন্দুস্থান-টিবেট রোড বা ন্যাশনাল হাইওয়ে ২২ ধরে। ওয়াংটু চেকপোস্টে আমাদের এক বন্ধু নেমে ইনার-লাইন-পারমিট দেখিয়ে আনল।

মনে তখন উত্তেজনা—সত্যিই তাহলে কিন্নরে আসা হল! বাস ক্রমশঃ চড়াইয়ের পথে উঠছে; জানলা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি দু'পাশে উঠে গেছে খাড়া পাথুরে পাহাড়, অনেক নিচে গভীর খাত বেয়ে বেগে বয়ে চলেছে শতদ্রু। মানালিতে বিয়াসের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছি, কিন্তু বিয়াসের সৌন্দর্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে দু'ধারের পাহাড় খুব কাছাকাছি, মনে হয় যেন শতদ্রু পাহাড়ের বুক চিরে জোর করে নিজের পথ করে নিয়েছে। মেটেরঙের জলের স্রোত দুর্বার—সুবিশাল পাথরের উপরে ঘা খেয়ে তা স্থানে স্থানে বিপরীতমুখী স্রোতের সৃষ্টি করেছে। এই নদীবক্ষে বিয়াসের মত নুড়ি-পাথরের প্রাচুর্য নেই; এর কোলে আছে অতিকায় সব পাথরের চাঁই। প্রস্তরের কঙ্কাল বলে যদি কিছু কল্পনা করা যায়, তবে এরা তাই; অবিরত জলের ঘায়ে এক ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে। হঠাৎ সামনে তাকিয়ে দেখি শতদ্রু যেখানে বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হয়েছে, সেখানে আকাশের গায়ে জেগে উঠেছে তুষারাবৃত হিমালয়—তার সুউচ্চ রূপালি শৃঙ্গ যেন আমাদের আরও কাছে যেতে আহ্বান করছে।

কল্পনায় পৌঁছে গেছি তুষাররাজ্যে, এমন সময়ে সহযাত্রীদের উত্তেজিত আলোচনায় বাস্তবে ফিরে এলাম। সামনে নাকি ধস নেমে রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে, বাস আর যাবে না। আমরা তখন এসে পৌঁছেছি টাপরি নামে একটি ছোট জনপদে। সমস্যা—টাপরিতে সরকারী আবাসগৃহ আছে, সেখানে থেকে যাব না পায়ে হেঁটে ধস পেরিয়ে কল্পার দিকে এগিয়ে যাব? স্থানীয় লোকেরা ও কণ্ডাক্টর আশ্বাস দিল যে ধস পেরিয়ে অন্য দিকে গেলে কল্পার জন্য গাড়ি পাওয়া যাবে। অতএব বেরিয়ে পড়লাম স্থানীয় লোকজনের পিছনে, অনিশ্চয়তায় ঝুঁকি নিয়ে। একা নই, আমরা তিনজন তো আছিই, তাছাড়া বাসের অন্যান্য যাত্রী প্রায় পঁচিশজন। হাঁটতে গিয়ে টের পেলাম যে পাহাড়ে হাঁটার কুশলতায় ও দমে আমরা সমতলের অধিবাসীরা পাহাড়ীদের তুলনায় কত পিছিয়ে আছি। যতক্ষণে আমরা ধসের সামনে এসে পৌঁচেছি, ততক্ষণে বাকি সকলে ধস পার হয়ে রাস্তা ধরে অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

সামনে বিশালাকৃতি পাথরের স্তূপ দেখে বিশ্বাস হচ্ছিল না যে তা পেরিয়ে অন্যদিকে যাওয়া যাবে। বিশেষতঃ যেখানে পাশেই নরম মাটি ধসে পড়ে নেমে গেছে সোজা শতদ্রুর বুকে। মন শক্ত করে নিচের দিকে না তাকিয়ে পার হলাম পাথরের বাধা—অনেক দূরে দেখতে পাচ্ছি বাসের অন্য যাত্রীরা হেঁটে চলেছে। ধস পেরিয়ে হেঁটেই চলেছি, সঙ্গী শুধু পাহাড় আর নদী; কোনরকম যানবাহনের দেখা নেই। বন্ধুরা আমার ভারী ব্যাগ বয়ে দেওয়া সত্ত্বেও কাঁধের ওপর চাপানো ছোট ছোট ব্যাগগুলোকে মনে হচ্ছে যেন পর্বত-প্রমাণ ওজনের। এভাবে অনেকক্ষণ চলার পর পথে পড়ল এক আর্মি ক্যাম্প। তার কাছেই এইচ. আর. টি. সি.-র এক বাসের দেখা পাওয়া গেল—তাতে আমাদের বাসের অধিকাংশ যাত্রী উঠে পড়েছে। কিন্তু না, আমাদের গল্প কি এত সোজা পথে চলে? আমরা যেতে চাই কল্পায়, নিদেনপক্ষে তার ১৩ কিমি আগে পিওতে (যেখানে P. W. D.-র সরকারী বাসস্থান আছে), কিন্তু এই বাস পিও অবধি যাবে না। আশ্বাস পাওয়া গেল যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলে পিও-র বাস পাওয়া যাবে। অগত্যা মোটঘাট নামিয়ে রেখে হতাশ নয়নে বিদায় জানালাম অন্য যাত্রীদের; সঙ্গে রইল আমাদের পুরনো বাসের কণ্ডাক্টর আর জনচারেক যাত্রী।

বৃষ্টি তখনও সঙ্গেই রয়েছে। আমরা দাঁড়িয়েছি রাস্তার ধারে পাহাড়ের গায়ে লাগানো এক দোকানের তলায়। ভিজে পাথরের উপর রাখা আছে মালপত্র। পিছল পাথরের সিঁড়ি বেয়ে উপরের দোকানে উঠতে তার উষ্ণ অভ্যন্তর তৎক্ষণাৎ আমাদের মন জয় করে নিল। গনগনে আঁচে রান্না হচ্ছে ভাত, ডাল, তরকারী—গরম চা তো আছেই। উনুনের এক পাশে দেখি বাসনের মধ্যে রাখা আছে টুকরো করা মাংস—রান্নার অপেক্ষায়। লোভ হচ্ছিল তার শেষ অবস্থাটা দেখে যাই, তবে তার আগেই এইচ. আর. টি. সি.-র আর একটা বাস এসে হাজির। দোকানের বাইরে বেরিয়ে পাহাড়ের কোলে চোখ রাখতেই চমকে উঠলাম—রামধনু! বরফে ঢাকা

হিমালয়ের চূড়া, তার কোলে সাতরঙা রামধনুর বাহার—এ দৃশ্য ভুলব কি করে? বৃষ্টি বোধহয় আমাদের অভিশাপে বিরক্ত হয়ে নিজের ঝুলি থেকে অনেক রতনের একটি বার করে দেখিয়ে দিল।

বাসে এবার আমাদের দ্বিতীয় দফা যাত্রা শুরু। আমির তৈরী সাঁকোর উপর দিয়ে শতদ্রু পার হলাম, তারপর শতদ্রুর উল্টো ধার ধরে বাস এগিয়ে চলল আরও উপরে। বাসে বসে আবার নিশ্চিন্ততার আরামে ডুবে গেছি, জানলা দিয়ে মাথা বার করে নিঃশেষে উপভোগ করছি রুক্ষ কিন্নরের সৌন্দর্য। কিন্তু সুখ তো সবার কপালে টেকে না, তাই কিছুদূর গিয়ে বাস আবার দাঁড়াল। সামনে ধস, অতএব মোটঘাট নিয়ে হাঁটতে হবে আবার। তখন বেলা পড়ে আসছে। জনমানব-শূন্য প্রকৃতির মাঝখানে আমরা কয়েকটি প্রাণী। কাছাকাছি লোকালয় পোওয়ারী প্রায় ৭ কিমি দূরে। অনেক নিচে পাথরের গায়ে আছড়ে পড়া নদীর জলকে ঘোর শত্রু বলে মনে হচ্ছে। দু পাশের অভ্রভেদী পাহাড়ের কাছ থেকে রাত্রির মত কোন আশ্রয় আশা করা বাতুলতা। কাজেই সহযাত্রীদের পিছনে আবার চলো মালপত্র কাঁধে করে।

এবারে ধসের চেহারা দেখে বুক শুকিয়ে গেল। পাথরের চাঁই নয়, ঝুরো মাটির স্তূপ নেমে এসেছে পাহাড়ের মাথা থেকে, গড়িয়ে পড়ছে শতদ্রুর কোলে। সঙ্গে মিশে আছে ছোট ছোট পাথরকুচি। একবার পদস্খলন হলে নদীবক্ষ ছাড়া গতি নেই। কিন্তু এখানে বিপদে অভয় দেওয়ার মত কাণ্ডারীরা এতক্ষণে বহুদূর এগিয়ে গেছে—ভয়ে টালবাহানা করলে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন হবার সম্ভাবনা। সেই আশঙ্কাই মনে জোর এনে দিল; সাহস করে পা দিলাম ঝুরো মাটির বুকে আর আশ্চর্য ব্যাপার, এই দ্বিতীয় বাধাও পার হয়ে গেলাম। আবার চলা। চলতে চলতে এসে পৌছলাম এক ঝরণার সামনে। এর আগে কল্পনায় কত কবিত্ব করেছি ঝরণা নিয়ে; এখন তা পার হতে গিয়ে নিদারুণভাবে উপলব্ধি করলাম যে এটি জলকণার সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। বেশ চওড়া এই পাহাড়ী ঝরণা পাহাড়ের গা বেয়ে এসে রাস্তার উপর দিয়ে গড়িয়ে পড়েছে নদীর খাতে। পাকা রাস্তায় ঝরণার মধ্যে দিয়ে হেঁটে এগিয়ে যেতে হল যার ফল-শ্রুতি সপ্‌সপে ভিজে জুতো ও মোজা। এতক্ষণ ভাবছিলাম বুঝি কাঁধে চাপানো বোঝার দরুন ব্যথা আর চড়াই ওঠার দরুন হাঁসফাঁস করার চেয়ে কষ্টকর আর কিছু হতে পারে না। পা ভিজে যাওয়ায় বুঝলাম কষ্টের অনুভূতিকেও ঝালমশলা দিয়ে নানাভাবে তীক্ষ্ণ করা যায়। ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে চলেছি, এমন সময়ে একটা বাস উল্টোদিক থেকে এসে টাপরির দিকে চলে গেল।

কিন্তু পিছনে ধস; কাজেই গাড়ি নিশ্চয়ই আমাদের দিকেই ঘুরে আসবে। আরও এগিয়ে বুঝলাম আমাদের অনুমান ঠিক, কারণ আমাদের বাসের কণ্ডাক্টর ও অন্য চারজন সহযাত্রী দেখি নির্জন রাস্তার একধারে বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। অপেক্ষমাণ দলটির সামিল হলাম আমরাও। কিন্তু কই? পাহাড়ী রাস্তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চোখে ব্যথা হয়ে গেল, বাসের ঠিকানা নেই। এদিকে চতুর্দিকে গা-ছমছমে অন্ধকার নেমে আসছে, গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়নের মত খাতের মধ্য দিয়ে বহতা শতদ্রুর মেটেজলের রঙ বদলে হয়েছে লাল, আবার লালের থেকে রঙ বদলে কালচে; রাস্তার উল্টোদিকে খাড়া পাহাড়গুলোকে মনে হচ্ছে অতিকায় দৈত্যের মত। জল্পনা শুরু হল; তবে কি বাস খারাপ হয়েছে? পোওয়ারী তখনও পাঁচ কিমি দূরে, এই অন্ধকারে হেঁটে গেলে সেখানে অক্ষতদেহে পৌছতে পারব কিনা জানি না। কিন্তু না, ভাগ্য আমাদের প্রতি এতটা নির্দয় নয়, ঐ তো অন্ধকার পাহাড়ের গা বেয়ে এগিয়ে আসছে একজোড়া উজ্জ্বল হলুদ আলো—আমাদের বাস!

উঠলাম আবার—ডেস্টিনেশন পিও। পথে এক এক করে বহু যাত্রী উঠল। অনেকটা অন্ধকার পথ পেরিয়ে কয়েকটা আলো দেখা গেল এক জায়গায়—পোওয়ারী। পোওয়ারী পার হয়ে বাস ছুটে চলল পিওর উদ্দেশে, তবে প্রকৃতির ধমকে শীগগিরই থামতে হল তাকে। পিও যাবার রাস্তায় ধস—রাস্তা বন্ধ। অগত্যা পোওয়ারী ফিরতে হবে। এবার দেখলাম পাহাড়ী বাসচালকের কুশলতা—যেহেতু গাড়ি ঘোরানোর জায়গা সেখানে নেই, অনেকটা পথ সে কণ্ডাক্টরের নির্দেশে বাস পিছিয়ে নিয়ে গেল; পিছু হটতে হটতে যথেষ্ট চওড়া জায়গা পেলে বাস ঘুরিয়ে সোজা করে নিয়ে ফিরে চলল পোওয়ারীর দিকে। সেখানে পৌছে দেখি চারদিকে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার—বোধহয় লোডশেডিং হবে।

রাত তখন প্রায় আটটা-সাড়ে আটটা। সহযাত্রীরা সকলেই পায়ে হেঁটে এক ঘণ্টার চড়াই পেরিয়ে পিও যাবে—পাকা রাস্তায় নয়, পাহাড়ের সরু পায়ে-চলা পাথুরে পথ দিয়ে শর্ট-কাট-এ। ওদের কথা শুনে মনে হল, পোওয়ারীর সরকারী রেস্ট হাউসও ঐ পথে পড়বে। অতএব টর্চ জালিয়ে ওদের পিছু নিলাম। এবার শুরু হল আমাদের ভ্রমণের এক নতুন পর্ব।

প্রথমটা যন্ত্রচালিতের মত সামনের লোকের পিছু পিছু পাহাড়ে চড়ছিলাম, কিন্তু শীগগিরই দম জানান দিতে লাগল। ক্রমাগত সামনের যাত্রীদের সঙ্গে আমাদের দূরত্ব বেড়ে চলল। অল্পক্ষণ পরে কিন্তু খেয়াল করলাম যে অধিকাংশ লোক এগিয়ে গেলেও জনচারেক লোক সর্বদাই আমাদের সঙ্গে আছে। তবে কি খাড়া পাহাড় বেয়ে উঠতে এরাও হাঁসফাঁস করছে? আদৌ না। বরং শহরে অতিথিদের যাতে রাতের অন্ধকারে চড়াই উঠতে গিয়ে বিপদে না পড়তে হয়, সেইজন্যই তারা আমাদের বিশ্বস্ত বন্ধুর মত আগলে রেখেছিল। আমাদের তিনজনের মধ্যে দুজনের মালপত্র এরাই বয়ে দিল। অতিরিক্ত পরিশ্রম ও ক্লান্তির দরুন পা যখন টলমল, ফুসফুস যখন জানাচ্ছে তীব্র প্রতিবাদ, মুখ ফুটে যখন বলে ফেলছি 'আর পারছি না', তখন এরাই উৎসাহ যোগাচ্ছে—'বাস্, অউর পাঁচ মিনট। সড়ক অব বিলকুল পাস হ্যায়।' স্তোকবাক্যে ভুলে আবার পা বাড়িয়ে দু'কদম চলেছি, কিন্তু চড়াইয়ের শেষ কই? এখনও তো পাহাড়ের মাথা দেখা যাচ্ছে না! তখন বুঝলাম যে ক্রমাগত আশ্বস্ত করে, উৎসাহ দিয়ে কিভাবে আমাদের বন্ধুরা আমাদের আপাত-অলক্ষ্য পাহাড় পেরোতে সাহায্য করছে। সেদিন ওরা আমাদের ফেলে এগিয়ে গেলে হয়ত রাতটা ঐ পাহাড়েই কোথাও কাটাতে হত।

চলতে চলতে খেয়াল হল যে ঝরণার জলে ভেজা জুতো-মোজা কখন যেন দেহের উত্তাপে শুকিয়ে গেছে। যতক্ষণ চলছি ততক্ষণ মাথায় একটাই সুর বাজছে, 'আর কতদূর?' প্রতি পদক্ষেপে মনে হচ্ছে, এবার বসে পড়ব, আর দম নেই। অন্তরা চলে যায় যাক। তারপরই আবার সামনের উঁচু পাথরে পা রেখে অন্ধকার পথে চড়াই উঠেছি। পায়ের ও ফুসফুসের জোরের সঙ্গে মনের জোরও যে পাহাড়ে ওঠার পক্ষে কতোটা প্রয়োজন, তা সেদিন পুরো-দস্তুর বুঝতে পেরেছিলাম।

অবশেষে সকলে পাহাড়ের মাথায় পাকা রাস্তায় পৌঁছবার পর নতুন বন্ধুরা আমাদের ঘিরে হৈ-হৈ করে একটা ছোটখাটো উৎসব করে ফেলল। মনে হচ্ছিল, না জানি কি অসাধ্যসাধন করে ফেলেছি! সবচেয়ে ভাল লাগল যে আমাদের দুরবস্থা নিয়ে কোন হাসাহাসি বা ব্যঙ্গোক্তি কানে এল না। দম নিয়ে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলে সকলের কথাবার্তা শুনে বুঝতে পারলাম যে আমরা পিও পৌঁছে গেছি। আনন্দের সীমা রইল না। এত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও পিও পৌঁছতে পেরেছি। তবে, না, এখনও কিছু পথ হাঁটা বাকি। পাকা সড়কের পথে পিওর সরকারী রেস্ট হাউস কাছাকাছি বাজার অঞ্চল থেকে প্রায় আড়াই কিমি দূরে। অতএব টিপটিপে বৃষ্টির মধ্যে অন্ধকার পথে আবার চলো। অসুবিধা হল না অবশ্য, কারণ নতুন বন্ধুদের তিনজন আমাদের সঙ্গে চলল রেস্ট হাউস অবধি পৌঁছে দিতে। বাকিরা বাজারের কাছ থেকে বিদায় নিল।

এই তিনজনের মধ্যে একজন আমাদের কাছে দেখা দিয়েছিল প্রায় দেবদূতের মত। পেশায় কনস্টেবল এই সুদর্শন যুবকের নাম ঠাকুর বলবন্ত সিং। তার তত্ত্বাবধানে আমরা পিওর সরকারী রেস্ট হাউসে পৌঁছলাম এবং তারই সুপারিশে রাত্রিবাসের সুবন্দোবস্ত করা গেল (আমাদের কাছে সরকারী দপ্তরের কোন চিঠি ছিল না)। ঠাকুর বলবন্ত সিং আদপে মণ্ডি জেলার অধিবাসী, কিন্তু কর্মসূত্রে এখন কিন্নরে। এর কথা শুনে বুঝলাম যে এ পর্যন্ত যারা আমাদের সঙ্গী ছিল, তারা প্রায় সকলেই মাণ্ডি-কুলু-মানালি প্রভৃতি স্থান থেকে কর্মসূত্রে কিন্নরে এসেছে। এদের সঙ্গে স্থানীয় অধিবাসীদের সদ্ভাব নেই, তাও কথায় কথায় বোঝা গেল। যাই হোক, ক্লান্ত শরীর রাখার মত একটা ঠাঁই করা গেলেও পেট শীগগিরই জানান দিতে লাগল যে বেলা দুটোর পর থেকে পেটে দানাপানি পড়েনি—তখন রাত প্রায় দশটা। অগত্যা আমাদের তিনমূর্তির একজন বেরিয়ে পড়ল খাবারের খোঁজে (রেস্ট হাউসের ভাঁড়ার শূন্য)—অবশ্যই ঠাকুর বলবন্ত সিং-এর তত্ত্বাবধানে। অবশেষে রাত এগারটার পর তারা যখন ফিরল, তখন সঙ্গে গরম চাপাটি ও ধোঁয়া-ওঠা ডিমের ডালনা। কিন্তু না, দোকান থেকে

কেনা নয়, কারণ এত রাতে সব দোকানই তাদের থালিহাতে ফিরিয়ে দিয়েছে। রেস্ট হাউসের কাছে নিজের কোয়ার্টার থেকে ঠাকুর বলবন্ত সিং রান্না করে নিয়ে এসেছে, উপরন্তু আমাদের বন্ধুকে চা করে খাইয়েছে। আমরা তখন অভিভূত; ধন্যবাদ জানানোর ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। পরে অনেকবার মনে হয়েছে যে মানবিকতার এই উষ্ণ নিদর্শন পাওয়াতেই আমাদের কিন্নর ভ্রমণের সার্থকতা।

পরদিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে জানলার পর্দা সরিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম—ঝকঝকে নীল আকাশের পটভূমিতে তুষারাবৃত হিমালয়ের শৃঙ্গরাজি যেন আকাশে আধিপত্য বিস্তার করেছে। খোঁজ নিয়ে জানলাম যে এর মধ্যে একটি হল কিন্নর-কৈলাস পর্বতশৃঙ্গ (৬০৫০ মিটার)। রাতের অন্ধকারে শ্রান্তদেহে চলতে চলতে বুঝতে পারিনি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কোন্ ভাণ্ডারের কাছাকাছি এসে পড়েছি। চারপাশে তাকিয়ে দেখলাম যে এই স্থানটি মোটেই রুক্ষ নয়, বরং শ্যামলিমায় ছাওয়া। নেওজা, বান, ইত্যাদি গাছে ঢাকা সবুজ পাহাড়ের মাথায় রজতশুভ্র পাহাড়ের চূড়ার বাহার বর্ণনার অতীত। পরে জেনেছিলাম যে এই স্থানটি নিচার (Nichar) বনমণ্ডলের অন্তর্গত। সিমলা থেকে ২৩০ কিমি দূরে অবস্থিত পিওর উচ্চতা ২২৯০ মিটার—আমাদের গন্তব্যস্থল কল্পা অবশ্য পিওর থেকে আরও ১৩ কিমি দূরে। ৯২৩৮ ফুট উঁচু কল্পায় নাকি থাকার বিশেষ সুবিধা নেই। অতএব কল্পায় গিয়ে একদিনের মধ্যে ঘুরে পিওতে ফেরত আসাই ভাল। পিও ও কল্পার মধ্যে এইচ. আর. টি. সি.-র বাস ছাড়াও বেসরকারী মিনিবাস চলে।

বাসের কথায় মনে পড়ল, ধসে বিধ্বস্ত একই রাস্তা দিয়ে সিমলা ফিরতে হবে তার পরের দিন। এইখানে বলে রাখি যে কিন্নরে আসার আগে শুনেছিলাম যে এখানকার আবহাওয়া শুকনো, বৃষ্টি একেবারেই হয় না। ঘটনাচক্রে আমরা আসার সাতদিন আগে থেকে এখানে একনাগাড়ে বৃষ্টি হয়েছে। এই অঞ্চলে পাহাড়ের গায়ে পাথরের উপরের মাটির আবরণ সামান্য, তাই অল্প বৃষ্টিতেই ধস নামে। তবে আর্মির ক্যাম্প থাকার দরুন রাস্তা পরিষ্কার হয় দ্রুত, প্রয়োজন হলে তারা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বড় বড় পাথর গুঁড়ো করে রাস্তা সাফ করে দেয়। অতএব কিছুটা আশ্বস্ত হলাম যে পরদিন সিমলা পৌঁছতে অসুবিধা হবে না।

সেদিন বাসের সহযাত্রী স্থানীয় দুই নতুন বন্ধুর উৎসাহে পায়ে হেঁটে পিও থেকে কল্পায় উঠলাম। গতরাত্রের আর আজকের চলায় কত তফাত! রোদে গা তাতিয়ে আপেলে কামড় বসাতে বসাতে ঝাড়া হাত-পায়ে পাহাড় চড়ছি; নীল আকাশের কোলে হিমালয়ের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ইচ্ছামত দাঁড়িয়ে পড়ছি, কখনও নবাগত ঝরণার ঠাণ্ডাজলে হাতমুখ ধুয়ে নিচ্ছি। কল্পা যাওয়ার পথে চোখে পড়ল অনেক আপেল-বাগিচা; অধিকাংশ বাগান পাথরের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা আর ঢোকবার জন্যে আছে উজ্জ্বল রঙ করা সুদৃশ্য একটি করে কাঠের গেট। গাঢ় লাল ফলের বাহার দেখিয়ে আমাদের বন্ধুরা জানাল যে এখানকার আপেল নাকি হিমাচলের মধ্যে সবার সেরা; অনেক রপ্তানিও হয়।

স্থানীয় অধিবাসীদের চেহারায় কিছুটা মঙ্গোলিয়ান ছাপ; চোখ ছোট, নাক উন্নত নয়। কিন্নরীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুন্দরী চোখে পড়ল না, যদিও প্রচলিত ধারণা অন্যরকম। তবে এদের পোশাকের বাহার দেখবার মত। রঙীন কাজ করা দুটি শাল দিয়ে তৈরী হয় মেয়েদের পোশাক—একটি ভাঁজ করে পিছনদিকে লাগানো থাকে, অপরটি সর্বাঙ্গে জড়ানো থাকে। এর উপরে অনেকে পরে উজ্জ্বল মেরুন বা সবুজ রঙের ভেলভেটের কোট, তাতে সোনালি জরির পাড় বসানো। বুকের উপর রূপোর বিশাল ব্রোচ দিয়ে অনেকে শাল আটকে রাখে। কানে সাত-আটটা করে দুল। মাথায় পশমী টুপি—মেরুন বা সবুজ, তাতে জরির পাড় বসানো। কোন কিন্নরী কানে, টুপিতে ঝলমলে হলুদ গাঁদাফুল লাগিয়ে নিজেকে আরও সুসজ্জিতা করে তোলে। এরা খুব পরিশ্রমী—কল্পায় পৌঁছবার পথে দেখলাম ঝরণার জলে মেয়েরা কাপড় কাচছে, অনেকে বাড়ির চালে কি সব শুকোতে দিচ্ছে। লক্ষ্য করে দেখি, টুকরো করে কাটা আপেল রোদে শুকোনো হচ্ছে শীতকালের ভাঁড়ারে যাবে বলে। ৯২৩৮ ফুট উঁচু কল্পা শীতে কয়েকমাস সম্পূর্ণ তুষারাচ্ছাদিত থাকে। সেই সময় সমতল থেকে রসদ প্রায়ই এখানে এসে পৌঁছতে পারে না। অতএব এখন থেকেই চলছে তাদের শীতের প্রস্তুতি; তেল, কেরোসিন, কাটা আপেল, রসুন, অন্যান্য খাবার, এমন কি পশুর খাদ্য ঘাস অবধি

এরা শীতের জন্য মজুত করে রেখে দেয়। কল্পায় দেখলাম কাঠের বাড়িগুলির গায়ে লাগানো কাঠের তক্তা থেকে চাপড়া চাপড়া ঘাস ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

কল্পাতে কিন্তু কোন গবাদি পশু চোখে পড়ল না (কুকুর অবশ্য সর্বত্র আছে)। অতিরিক্ত ঠাণ্ডার দরুন এখানে সমতলের গরু-মোষ বাঁচতে পারে না; গরু বলতে আছে লম্বা লোমবিশিষ্ট ইয়াক। গ্রীষ্মকালে এই ইয়াক এবং ভেড়া-ছাগল নিয়ে মেষপালকেরা চলে যায় আরও উঁচু পাহাড়ে ও সেখানে পশু চরায় কয়েকমাস। শীত যখন আসন্ন, তখন তারা নেমে আসে নিজেদের গ্রামে ও শীতকালে পশুর দল নিয়ে নেমে যায় আরও নীচে; অনেক সময় মণ্ডি অবধি নেমে যায় তারা। এদের চাষও করতে হয় অনেক দূর পাহাড়ে গিয়ে। কল্পার আশেপাশে প্রায় সবই ক্যাশ ক্রপ চাষ হয়, যেমন আপেল, পীচ, অ্যাপ্রিকট ইত্যাদি। খাদ্য-শস্য বেশী চাষ করে এরা আরও দূর-দূর পাহাড়ের কোলে।

কল্পার রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে দু'পাশে যে বাড়িঘর, দোকান চোখে পড়ল সেগুলি বেশ নোংরা। যেসব বাচ্চা-দের খেলতে দেখলাম, তাদের বেশভূষা মলিন ও হাতমুখ কালিঝুলিমাখা। বাড়িঘর এখানে হিমাচলের অন্যান্য জায়গার তুলনায় স্বতন্ত্র, কাঠের সুন্দর কারুকাজ করা বাড়ি। ধূসর রঙের স্লেটপাথরের টালি দিয়ে ছাওয়ার ধরনে যেন বৌদ্ধ প্যাগোডার প্রভাব দেখা যায়। এই একই প্রভাব লক্ষ্য করলাম বর্ণাঢ্য নারায়ণের মন্দিরে; স্বর্ণাভ চূড়া সম্বলিত এই মন্দিরের ছাঁদ ও কাঠের কারুকাজ দেখলে বৌদ্ধমন্দির বলেই ভ্রম হয়। তিব্বতের সংস্কৃতির প্রভাব কল্পায় সুস্পষ্ট। কিন্নরের পূর্বে তিব্বত ও দক্ষিণ-পশ্চিমে সিমলা জেলা। কল্পার উত্তর-পূর্ব দিকে ৬৬ কিমি দূরে পুঃ (Pooh) বলে একটি জায়গা আছে—তার অনতিদূরে তিব্বতের সীমানা। তিব্বতের সীমানায় ভারতের 'জিরো লাইন'। আর্মি ক্যাম্প অবশ্য কৌরিক নামে এক জায়গায় যা কল্পা থেকে প্রায় ১৬০ কিমি দূরে। প্রতিবেশী এই কিন্নরভূমির অনেকেই 'দালাই লামা-র অনুগামী।

তিব্বতের এত কাছে চলে এসেছি, ভাবতেই রোমাঞ্চ হচ্ছিল। কিন্তু আরও বেশী রোমাঞ্চ হল যখন শুনলাম যে, হিমালয় পর্বতমালার যে শ্রেণী (গ্রেট হিমালয়ান ক্রেস্ট)-র সামনে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, তার কিছুটা উত্তরে গেলেই দেখা পাওয়া যাবে স্পিটি ভ্যালি বা উপত্যকার। ছোট-বেলায় ভূগোল বইয়ে পড়া স্পিটি উপত্যকার এত কাছে কোনদিন আসতে পারব স্বপ্নেও ভাবিনি। স্পিটি উপত্যকায় পৌঁছনোর আগে আসে কিছু নগ্ন পাহাড় যাতে সবুজের লেশমাত্র নেই। স্পিটিতে অবশ্য শতদ্রুর দু'পাশে চাষের যোগ্য জমি আছে, যদিও তা অপরিসর এবং নদীবক্ষ থেকে প্রায় হাজার ফিট উঁচুতে। কল্পা থেকে শতদ্রুর পাড় ধরে গেলে স্পিটিতে পৌঁছনো যায়, তবে সে পথ বিপজ্জনক। সেখানে যাবার অন্য রাস্তা হল মানালি থেকে কিছুদূরে ত্রিলোকনাথের পূর্বদিকে কুনজুম পাস (৫০০০ মিটার হবে)। কিন্নরের দর্শনীয় স্থানগুলির মধ্যে একটির নাম সাংলা উপত্যকা। টাপরি থেকে বাসে ১২ ঘণ্টার পথ। ছোট ছোট গ্রাম নিয়ে তৈরী এই সুন্দর উপত্যকা অবশ্য আমাদের অদেখাই থেকে গেছে—সময় হয়নি সেখানে যাবার।

সময়—কত বিচিত্ররূপে ধরা দেয় এ আমাদের কাছে। কল্পা ভ্রমণের শেষে পিওতে নেমে আসতে আসতে মনে হচ্ছিল যে সময় বড় নিষ্ঠুর। কারণ কাল ভোরে আবার মোটঘাট নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে পিও বাসস্ট্যাণ্ডের দিকে —সিমলায় ফেরার উদ্দেশ্যে। পরদিন সকালের উজ্জ্বল রোদে উপচে-পড়া ভিড়ের বাসে বসে চোখে পড়ল সময়ের আর এক রূপ। একদিন আগে কি এই পথেই গেছি? বিশ্বাস হয় না। কি বিপদসঙ্কুল, কি ভয়াবহ লেগেছিল নির্জন পাহাড় আর স্রোতস্বিনী শতদ্রুকে। অথচ আজ সকালের ঝলমলে সূর্যালোকে যেন নিষ্পাপ শিশুর মত নিজেকে মেলে ধরেছে কিন্নরের সুউচ্চ পাহাড়। অনেক নীচে বয়ে যাওয়া সাটলুজের চিকচিকে জলের স্রোতের নজরকাড়া রূপ। আশ্চর্য সময়ের মহিমা! আমার মন কিন্তু তার আরশিতে ধরে রেখেছে কিন্নরের গা-ছমছমে নির্জন সৌন্দর্যকে। মুখভার-করা আকাশের তলায় দৈত্যাকার পাথুরে পাহাড় মনে দাগ কেটে গেছে। সূর্যকিরণে মোহিনী শতদ্রু ভোলাতে পারেনি তার ভ্রূকুটি-কুটিল রূপ, যখন আসন্ন প্রদোষে তার আবর্তিত জলস্রোত এক ভয়ঙ্কর মোহে আকর্ষণ করেছিল আমাকে। এক সন্ধ্যার আলাপে ভয়াল-সুন্দর সেই কিন্নরকে ভালবেসেছি—তার স্মৃতিই মনে আজও উজ্জ্বল।